BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03120035

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 12| December 2025| e-ISSN: 2584-1890

# পিতৃতন্ত্রের ভেতর থেকে প্রতিবাদ: বাণী বসুর উপন্যাসে নারীর অবস্থান

**Sourav Mukherjee[1] & Dr. Chandra Sekhar Halder[2]**

1. Ph.D. Research Scholar, Department of Bengali, YBN University, Ranchi, Jharkhand
2. Assistant Professor, School of Arts and Humanities (Dept. of Bengali), YBN University, Ranchi,

**Abstract(সারসংক্ষেপ):** *এই গবেষণাপত্রে বাণী বসুর উপন্যাসে নারীর অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক অবস্থানকে নারীবাদী আলোচনার পরিসরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁর রচনায় নারী কোনো একমাত্রিক চরিত্র নয়; বরং আত্মপরিচয়ের সন্ধানী, আত্মমর্যাদাসচেতন এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এক জটিল মানবিক সত্তা। পঞ্চম পুরুষ, শ্বেতপাথরের থালা, শাকম্ভরীর দ্বীপ ও গান্ধর্বী প্রভৃতি উপন্যাসের আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে নারীর ব্যক্তিগত জীবনসংগ্রাম, দাম্পত্য সংকট, সামাজিক বঞ্চনা এবং অন্তর্লৌকিক মানসিক টানাপোড়েনের বহুমাত্রিক রূপ। এই গবেষণায় নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কীভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রান্তিক করে রাখে এবং সেই প্রেক্ষিতে বাণী বসুর নারীচরিত্রগুলি কীভাবে নীরব প্রতিরোধ, আত্মসচেতনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নিজস্ব অবস্থান নির্মাণ করে। পাশাপাশি নারী-নারী সহমর্মিতা, প্রজন্মান্তরের মানসিকতার পরিবর্তন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নও আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। পরিশেষে বলা যায়, বাণী বসুর উপন্যাসে নারী কেবল ভুক্তভোগী নন; তিনি চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী ও আত্মপ্রত্যয়ী এক সত্তা, যিনি সামাজিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে নিজের পরিচয় নির্মাণে সচেষ্ট। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সাহিত্য বাংলা কথাসাহিত্যে নারীবাদী চিন্তার এক গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ দিগন্ত উন্মোচন।*

**Keywords:** *নারীবাদ, বাণী বসু, নারীচরিত্র, আত্মপরিচয়, পিতৃতন্ত্র, দাম্পত্য সংকট, নারীস্বাধীনতা, সামাজিক বাস্তবতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, নারী-নারী সম্পর্ক।*

**মূল বক্তব্য:** বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে বাণী বসু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনায় সমাজ, সময় ও মানবসম্পর্ক নতুন ব্যাখ্যা পেয়েছে। বাণী বসুর উপন্যাসে নারী শুধু একটি চরিত্র নয়, বরং ইতিহাস ও সমাজের এক নীরব নথি। তিনি নারীর জীবনের ছোট-বড় ঘটনা, স্বপ্ন ও অপূর্ণতা, সংগ্রাম ও অবদমন—সবকিছু অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর সাহিত্য বিশ্লেষণ করতে গেলে নারীর অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সামনে আসে। পুরানো সাহিত্যে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে বলা যায়— "আমাদের দেশের পুরানো সাহিত্যে আমরা নারী-চরিত্রের অতুলনীয় মহিমা দেখতে পেয়েছি। সেই মহিমান্বিত নারী-চরিত্রের পাশে কোন কোন সময়ে পুরুষ চরিত্রগুলো দেখেছি অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল। ক্ষমাশীল প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে সুগভীর আত্মমর্যাদাবোধের কি সুন্দর উদাহরণ সীতার চরিত্র। দময়ন্তীর চরিত্রে কী অপরূপ বীর্য। দুঃখে দুর্দিনে আপন জীবন-সাথীর পাশে পাশে থাকবার দুরূহ ব্রত থেকে তাকে বিচ্যুত করা যাবে না। আপনার জীবন-সাথীকে দুঃখের মধ্যে ত্যাগ ক'রে বাপের বাড়ীর আরাম ভোগ করতে যেতে তাকে কিছুতেই রাজী করান যাবে না জেনেই, নল তাকে ঘুমের মধ্যে ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু তবু সেই একাকিনী অসহায়া নারী নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে না গিয়ে পথে পথে বেড়াল তারই সন্ধানে-যার সঙ্গে একদিন সে সুদিনে ও দুর্দিনে সুখ ও দুঃখে সমান ভাবে ভাগ ক'রে নেবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল। সেই পথে কত না দুঃখ, কত না অপমান তাকে সহ্য করতে হয়েছিল।"[১]

বাণী বসুর উপন্যাসে নারী কেবল পরিবারকেন্দ্রিক সত্তা নয়; তিনি তাকে এক স্বতন্ত্র মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাঁধন ভেঙে নারী কীভাবে আত্মপরিচয় খুঁজে নেয়, সেই সংগ্রাম তাঁর লেখার মূল সুর। তাঁর নারীচরিত্র কখনো ভুক্তভোগী, কখনো প্রতিবাদী, আবার কখনো আত্মপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ় এক সচেতন মানুষ। প্রেম, দাম্পত্য, মাতৃত্ব ও স্বাধীনতার প্রশ্নকে তিনি বাস্তব দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে বাণী বসুর উপন্যাসে নারীর অবস্থান বোঝা যায় নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিগত জীবনসংগ্রামের আলোকে, যা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করে।

নারীচেতনা মানবসভ্যতার ইতিহাসে পরিবর্তনের এক শক্তিশালী ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে। দীর্ঘদিন ধরে ইতিহাস রচনায় নারীর ভূমিকা উপেক্ষিত ছিল, অথচ সমাজ বিনির্মাণে নারীশক্তির অবদান অসন্দিগ্ধ। বিশ শতকের সত্তর দশকের পর থেকে নারীবাদী আন্দোলনের উত্থান বিশ্বচিন্তায় এক নতুন দৃষ্টিকোণের সূচনা করে। সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের পরিকাঠামো সবকিছুকেই নতুনভাবে বিচার করার আলো এনে দেয় এই আন্দোলন।

"Creation of Patriarchy' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে Gerda Lerner নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় পিতৃতন্ত্র সমাজের সৃষ্টি। পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি নিহিত আছে নারীজাতিকে দুর্বল, অসহায় এবং অক্ষম হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের উপর কর্তৃত্ব করার বাসনার মধ্যে। পিতৃতন্ত্রকে সহজেই জয় করা যায় যদি পিতৃতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশের ধরন ও আচরণগুলিকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এবং তার মুখোমুখি হওয়া যায়।"[২]

নারীবাদের মূল লক্ষ্য লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা এবং পিতৃতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এটি কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বরং সামাজিক বৈষম্য ও ক্ষমতাবিভাজনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম। কেট মিলেট পিতৃতন্ত্রকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করে "ব্যক্তিগতই রাজনৈতিক" ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিমে সূচনা হলেও ভারতীয় উপমহাদেশেও নারীর অধিকারচেতনা বিকশিত হয়েছে। মেরি উলস্টোনক্রাফট, সিমোন দ্য বোভোয়া, বেটি ফ্রিডান প্রমুখ চিন্তাবিদ নারীবাদকে সমৃদ্ধ করেছেন। নানা বাধা সত্ত্বেও এই আন্দোলন এগিয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গে বিভক্ত হয়ে ভোটাধিকার, সমতা ও পরিচয়ের প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়েছে।

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে নারীবাদী আন্দোলনের জন্ম। এই আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ফরাসি লেখিকা এবং অস্তিত্ববাদী দার্শনিক (Existentialist) Simone de Beauvoir, যিনি ছিলেন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক Jean Paul Sartre-এর সঙ্গিনী (তাঁরা আজীবন একত্রে বসবাস করেছিলেন, কিন্তু বিবাহ করেননি। কারণ বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাঁদের মতে নারীকে পুরুষের পদানত করে রাখার সামাজিক হাতিয়ার, যা অস্বীকার করা দরকার)। সিমোঁ দ্য বিউভার 1949 খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Second Sex' যা লিঙ্গের সামাজিক নির্মাণ ও নারীর অবস্থান সম্পর্কে অস্তিত্ববাদী দর্শনের দৃষ্টিতে এক অনবদ্য বিশ্লেষণ।"[৩]

"১৭৯২ সালে উলস্টোন ক্র্যাফেটর Avindication of the rights of woman বইটি প্রকাশিত হয়। আর এই লেখনীর মধ্য দিয়ে নারীবাদের সূচনা।"[৪]

নারীবাদী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চায় জে. অ্যান টিকনার (J. Ann Tickner) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর রচিত Gendering World Politics এবং Feminism and International Relations বই দুটো বিশ্বরাজনীতির ক্ষমতা-চর্চাকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। ১৯৮৮ সালে তাঁর উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলেসলি কলেজে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নারীবাদ নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনার থেকেই পরবর্তীতে International Studies Association (ISA)-এর মধ্যে Feminist Theory and Gender Studies (FTGS) শাখাটি গড়ে ওঠে, যা এখনও নারীবাদী আন্তর্জাতিক সম্পর্কচর্চার অন্যতম বৈশ্বিক সংগঠন।

নারীবাদী সমালোচনা প্রশ্ন তোলে কেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বে নারীর অভিজ্ঞতা উপেক্ষিত থাকে এবং কেন বিশ্বরাজনীতি কেবল পুরুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হয়। নারীবাদীরা দেখান যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি লিঙ্গনিরপেক্ষ নয়; বরং এটি লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার কাঠামো, যেখানে নারীরা ভিন্নভাবে প্রভাবিত হন। তাঁদের বিশ্লেষণে নিরাপত্তার ধারণা বিস্তৃত হয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক দিকও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি সংঘর্ষের কারণ হিসেবে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও শোষণের মতো

কাঠামোগত সমস্যার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই নারীবাদ সমান অংশগ্রহণ ও মানবিক বিশ্বরাজনীতির প্রয়োজনীয়তাকে সামনে।

বাণী বসুর উপন্যাসে নারীর অবস্থান একেবারেই প্রচলিত ধারার বাইরে। তাঁর নারীরা কেবল গৃহবন্দি, নিরুপায় বা ত্যাগী নন—তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ও মর্যাদার জন্য লড়াই করেন। এই লড়াই কখনও মানসিক, কখনও সামাজিক; কখনও আবার আত্মপরিচয় খোঁজার পথে এক গভীর আত্ম-আবিষ্কারের যাত্রা।

**খনামিহিরের ঢিপি** উপন্যাসে মধুরা, মাতঙ্গী ও রঙ্কা—এই তিন নারী চরিত্রের মধ্যে আদিম সমাজে নারী নেতৃত্ব ও সমতার ছাপ স্পষ্ট। এখানে নারী-পুরুষের বিভাজন নেই; বরং নারীরা গোষ্ঠীর নেতৃত্ব, যুদ্ধ, পরামর্শে পুরুষদের সমান ভূমিকা নেয়। লেখিকা এই আদিম সমাজের মাধ্যমে আধুনিক সমাজের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন। বাণী বসু নিয়ম বদলাতে চেয়েছেন— "সে এসেছিল স্ত্রীর সীমাহীন স্পর্ধায় ফুঁসতে ফুঁসতে। সে গালি দিয়েই যাবে। দিয়েই যাবে। তার স্ত্রী কেঁদেই যাবে, কেঁদেই যাবে। সে বেঁধে মারবে, তার স্ত্রী মার খেয়েই যাবে, খেয়েই যাবে। বুক শূন্য করে দেয় এমন রূঢ়তা, গুঁড়িয়ে ভেঙে দেয় প্রাণ- এমন অপমান। চিরকাল করে এসেছে, আবহমান পুং সাইকি তাকে দিয়ে এমনই করায়। এই ফর্মুলা যে অগ্রাহ্য করে, তার কী শাস্তি? কী শাস্তি তাকে যারা মদত দেয় তাদের? কম কষ্ট করে স্ত্রীর ঠিকানা বার করতে হয়েছে তাকে? বিশ্বসুদ্ধ লোক জেনে গেল। মালবিকা তাকে কম ধাতানি দেয়নি। মা-বাবা জেনে স্তম্ভিত। কসবায় বারবার ফোন করেও সাড়া পায়নি সে। কী করে পাবে? তখন তো সব নার্সিংহোমে, কে কখন আসছে, যাচ্ছে কোনও ঠিক নেই। অবশেষে দিল্লি এবং সেই সি-ই-ও মেসো। গম্ভীর গলা। মানুষ যত পদস্থ হবে তত গম্ভীর হবে তার গলা-হোয়াট হ্যাভ য়ু ডান টু হার? শি ইজ ব্রোকেন, ব্রোকেন ইন টু পিসেস। দিস ইজ ডিসগাস্টিং, আনপার্ডনেবল।"[৫]

কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়—

"নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে

আপনার রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।"[৬]

আবার বাণী-বসুর লেখনীতে কোথাও সমাজের চিত্র উঠে এসেছে— "হে সর্বমঙ্গলা, তুমি সমাজের হাতে গড়া রক্তমাংসের এক প্রতিনিধি পুতুল। আমি জানি না তুমি বিশেষ কি না। তুমি সেই সময়ের সব বধূর মতো শাশুড়ি-নিপীড়িতা, সব শাশুড়ির মতো বউ-কাঁটকি। সব মায়ের মতো ছেলেদের ব্যাপারে স্নেহান্ধ, মেয়েদের ব্যাপারে ভীত, তুমি সে সময়ের কলকাতা চব্বিশ-পরগনার ভাষায় আঁব, নুচি, নংকা বলতে, নেপ রোদে দিতে, নেবুর আচার করতে, কোনও অজ্ঞাত বিচারে বিলিতি আমড়ার ভক্ত থাকলেও বিলিতি বেগুন নৈব নৈব চ।"[৭]

**মৈত্রেয় জাতক**-এ নগরশোভিনী, প্রব্রাজিকা ও দাসীর চরিত্রের মাধ্যমে সমাজে নারীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান উঠে আসে। অনার্য নারীরা কিছুটা স্বাধীন হলেও, মূল সমাজে নারীর অধিকার ছিল প্রায় অনুপস্থিত। এই বৈপরীত্যই লেখিকার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। তাই বাণী বসু বলেছেন— "হায় বুদ্ধযুগের নারীকুল, প্রায়ই উচ্চশিক্ষিত, ব্যক্তিত্বময়ী, পূর্ণবিকশিত কিন্তু সামনে কোনও পথ খোলা পাননি। প্রব্রজ্যাই একমাত্র বিদ্রোহ যা তাঁরা করতে পেরেছেন।"[৮]

**পঞ্চম পুরুষ** উপন্যাসে এষা খান এক স্বাধীনচেতা, আত্মনির্ভর নারী। সমাজের প্রচলিত ধারণা—যে নারী কেবল স্ত্রী বা মা—তাকে সে মানতে রাজি নয়। এষা মাতৃত্বকে একটি মানসিক প্রস্তুতির প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে, এবং মনে করে যে নারীকে নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে হবে। তাই বাণী বসু বললেন— "হয়তো পুরুষরা ভাবে না সীমা, আমরাই তাদের ভাবতে বাধ্য করি। কারও ওপরেই কখনও খুব বেশি নির্ভর করতে নেই। পুলিশ এবং মিলিটারি ধরো আমাদের সবার রক্ষার দায়িত্বে আছে। তাই বলে কি জনসাধারণকে তারা বস্তু ভাবে, নিজেদের সম্পত্তি ভাবে? শ্রম ভাগ তো সমাজে থাকবেই, যার যার সামর্থ্যানুযায়ী। তোমার ওপরেও যাতে কেউ কেউ নির্ভর করতে পারে, এমনভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারো না?"[৯]

আবার এষা বলেছে— ""না সীমা, আমি কিন্তু লক্ষ করেছি নিজেকে স্বামীর বা অন্য কোনও পুরুষের মুখাপেক্ষী ভাবতে মেয়েরা এক ধরনের গৌরব বোধ করে। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি, ওর মত নেই, ও এই বলছিল এ রকম তুমি প্রায়ই এমন মেয়েদের

বলতে শুনবে যারা উচ্চশিক্ষিত, অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন। এটার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কী আমি জানি না, তোমারও মনে হয় নিজেকে স্বামীর সম্পত্তি ভাবতে গর্ব হয়, আমার মতো স্বাধীন মেয়েদের থেকে নিজেকে অনেক উঁচুদরের মনে হয়, তাই না?"'[১০]

সুতরাং, এই উপন্যাসে বাণী বসু কেবল গল্প বলেননি; তিনি সমাজের সামনে এক নির্মম বাস্তবতার আয়না ধরেছেন, যেখানে নারী তার সংগ্রাম, অপমান ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই নিজের পরিচয় নির্মাণ করে।

**গান্ধর্বী** উপন্যাসে অপালা দত্তগুপ্তের জীবন দেখায় কীভাবে একজন শিল্পী সংসারের চাপে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মেয়ে টিটু ও বন্ধু মিতুল তাকে নতুন করে বাঁচার সাহস দেয়—শেখায় যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই আত্মমর্যাদার প্রথম ধাপ। অপালার জীবনটা কতটা সংগ্রামের সেটা নিচের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি— "সে যখন রবীন্দ্রসদনের গেট দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরোচ্ছিল তখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরীর ওপর একটা প্রকান্ড লালচে কালো মেঘ। মাত্র একটাই।"[১১]

'গান্ধর্বী' উপন্যাসে বাণী বসু নারীর অন্তর্লীন শিল্পসংগ্রাম, আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান ও সামাজিক অবদমনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে একত্রে তুলে ধরেছেন। অপালা দত্তগুপ্তের চরিত্রে দেখা যায়—বিবাহোত্তর জীবনে গৃহস্থালির দায়ে তার শিল্পীসত্তা চাপা পড়ে যায়, যা নারীর স্বাতন্ত্র্যহীন অবস্থানকে স্পষ্ট করে। মিতুলের মাধ্যমে অপালার জীবনে পরিবর্তন আসে; তিনি অপালাকে নিজের শিল্পীসত্তা পুনরুদ্ধারে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সম্পর্ক নারী-নারী সহমর্মিতা ও সহযোগিতার এক শক্তিশালী দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে টিটু নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করে, যে মায়ের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার গুরুত্ব বুঝতে শেখে। ফলে উপন্যাসটি নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক সহায়তা এবং প্রজন্মান্তরের চেতনার পরিবর্তনকে গভীরভাবে তুলে ধরে।

"মানুষ হিসেবে আলাদা করে তার মূল্য কারো কাছে নেই। যতদিন সুন্দর, সে মোহন, যতদিন সে মানুষকে তাতাতে পারবে, ততদিনই তার দাম।...এই দেহসৌষ্ঠব যখন ঝরে যাবে, কণ্ঠলাবণ্য অন্তর্হিত হবে, এই ব্যাখ্যাতীত আকর্ষিকা শক্তি ফুরিয়ে যাবে, তখন আর তাকে কেউ পুঁছবে না।"[১২]

উপন্যাসে সোহমের সঙ্গে অপালার পুনর্মিলন শিল্পীসত্তার এক আন্তরিক সংযোগকে নির্দেশ করে, যেখানে কোনও প্রণয়ঘটিত টানাপোড়েন নয়, বরং সঙ্গীতের প্রতি অভিন্ন অনুরাগই মুখ্য হয়ে ওঠে। তবে এই সম্পর্ক শিবনাথের দৃষ্টিতে সন্দেহ ও ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতারই প্রতিফলন।

"তুমি একটু দূর থেকে দ্যাখো, এই সমস্ত আলাপচারি জুড়ে কিন্তু আমি, অপালা, একটা মেয়ে গাইছি এটাও আছে। মানে আমি নয়, আমার ভেতরের যে মানুষটা গান গায়। আমার ভেতরটা। সেটা।"[১৩]

উপন্যাসের অন্তিম অংশে টিটুকে কথক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এর মাধ্যমে অপালার অব্যক্ত বেদনা, তার শিল্পীসত্তার সংগ্রাম এবং নীরব প্রতিরোধ এক নতুন ভাষা লাভ করে। ফলে গান্ধর্বী কেবল একটি ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনি নয়, বরং তা হয়ে ওঠে নারীর আত্মমুক্তি ও শিল্পসত্তার পুনর্দাবির এক প্রতীকী দলিল, যেখানে নারীই নারীর সহযাত্রী ও শক্তির উৎস।

**শ্বেত পাথরের থালা** উপন্যাসে বিধবা বন্দনার জীবনে দেখা যায় সমাজের মুখোশধারী প্রগতিবাদের আসল রূপ। একবিংশ শতাব্দীতেও বিধবার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও সমাজের দ্বৈত মানদণ্ড এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাণী বসুর 'শ্বেত পাথরের থালা' উপন্যাসে আধুনিকতার মুখোশধারী সমাজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা নারীবিরোধী মনোভাবকে স্পষ্টভাবে উন্মোচিত করা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যেখানে নারী-পুরুষ সমতার কথা উচ্চারিত হয়, সেখানে বাস্তবে নারীর জীবনে, বিশেষত বৈধব্যের ক্ষেত্রে, এখনও বহমান রয়েছে কঠোর ও অমানবিক সামাজিক বিধিনিষেধ। তাই লেখিকা প্রতিবাদ জানিয়েছেন— "বৈধব্যের কুসংস্কারগুলো পালন করি না বলে, আমি সস্তা হয়ে গেছি, আমার সঙ্গে যা খুশি ব্যবহার করা চলে? সম্পত্তি, ডিগ্রি, চাকরির লোভ দেখিয়ে আমাকে কিনে নেওয়া চলে?"'[১৪]

উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকা বন্দনা চরিত্রটি এই নির্মম বাস্তবতার এক জীবন্ত প্রতীক। শিক্ষিতা ও সচেতন হওয়া সত্ত্বেও, স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ফেলে সমাজের আরোপিত শোকাচ্ছন্ন নিয়ম—শ্বেতবস্ত্র, নিরামিষ আহার, নিঃসঙ্গতা ও জীবনবিমুখতা। এই বিধিনিষেধ কেবল বাহ্যিক নয়, বরং তার মনোজগতে সৃষ্টি করে গভীর প্রশ্ন ও ক্ষোভ। একই পরিস্থিতিতে

একজন পুরুষকে কখনও এমন কঠোরতার সম্মুখীন হতে হয় না—এই বৈপরীত্যই উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তোলে। লেখিকা সমাজ পরিবর্তনের দিক নির্দেশে বলেছেন— "হঠাৎ ভীষণ ভয় লাগল বন্দনার। যাকে খুব আপন জন বলে জানি, আদ্যোপান্ত চেনা, হঠাৎ যদি দেখা যায় সে প্রতারক, যাকে ভাই বলে জানি, সে ভাই নয় ভাই সেজে এতদিন ঠকিয়েছে, ছেলে আসলে ছেলে নয়, কোনও অচেনা মানুষ এরকম চেহারার সুযোগ নিয়ে ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে গেছে, তাহলে যেরকম আতঙ্ক হয়, এ সেই ভয়ানক আতঙ্ক। যে রূপ মা বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনে ঘৃণায় বিদ্রোহ ফেটে পড়েছিল তাকে সে তবু খানিকটা চেনে। কিন্তু আজ যে নিজের স্বার্থের জন্য মাকে বিয়ে করতে বলছে সেই রূপকে তার একদম অপরিচিত লাগল।"[১৫]

বন্দনার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নগুলো সমাজের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। সে জানতে চায়—মানবিক চাহিদা, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিসত্তা কি কেবল নারীর ক্ষেত্রেই অস্বীকৃত? এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই লেখিকা সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং নারীর স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন।

"সত্যিই তো, আমি ভর্তৃহীনা ধূমাবতী। বেঁচে থাকবার ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু শুধু আমার উদাসভাবে গ্রহণ করা উচিত। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার একমাত্র পরিচয় আমার ভাতের থালায় আর আমার পরনের কাপড়ে। সেখানে যদি পরিচয় না রাখতে পারি তাহলে পুত্রবধূর কাছ থেকে এই অপমান আমার প্রাপ্য।"[১৬]

'শ্বেত পাথরের থালা' এখানে এক গভীর প্রতীক—যা নারীর বৈধব্যজীবনের একঘেয়ে, নিস্তরঙ্গ ও বঞ্চিত অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। এই উপন্যাস শুধুমাত্র শোক বা সামাজিক নিপীড়নের বর্ণনা নয়; এটি এক শক্তিশালী প্রতিবাদ, এক অন্তর্দাহের প্রকাশ এবং নারীর আত্মমর্যাদা পুনর্দাবির একটি সাহসী উচ্চারণ।

**অষ্টম গর্ভ** উপন্যাসের দেবহুতি চরিত্রটি নারীর প্রজনন-ভূমিকার প্রতি সমাজের নির্মম মনোভাব তুলে ধরে। সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাকে নারীর পরিচয়ের একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে দেখা—এই পিতৃতান্ত্রিক ধারণার বিরুদ্ধে লেখিকার কণ্ঠস্বর তীব্র ও প্রতিবাদী। বাণী বসুর 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসটি মূলত বাংলার ইতিহাসের এক বেদনাবিধুর সময়কে কেন্দ্র করে নির্মিত, যেখানে মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশভাগের মতো ঘটনাগুলি মানুষের জীবনে কী ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছিল, তা অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে চিত্রিত হয়েছে। তবে লেখিকা কেবল ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেননি; বরং সেই সময়ের সামাজিক বাস্তবতা, বিশেষত নারীর অবস্থান, যন্ত্রণা ও অসহায়তাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

"বিধ্বস্ত জননী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিন দিনের নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের পর প্রথম সুযোগেই নিবিড় ঘুম এসে তাঁকে অধিকার করেছে। স্বপ্নহীন ঘুম। মৃত্যুপম, কিন্তু মৃত্যু নয়। শরীরের প্রতিটি কোষ ঘুমোচ্ছে। তিনি জানেন না তিনি কে, কোথায়। জানেন না তাঁর সাতটি সন্তান আছে এবং এক দফায় আজ তিনি তিন সন্তানের মোট দশ সন্তানের দশভুজা জননী হয়ে গেলেন। আরও জানলেন না বত্রিশ বছর বয়সে নিরবচ্ছিন্ন সন্তান প্রসবের পর এই আজকের লড়াইয়ে তিনি আর সন্তানধারণের ক্ষমতা হারালেন। এই অকল্পনীয় মুক্তির কথা জানলে হয়তো তিনি আরও আরও আরও ঘুমোতে পারতেন।"[১৭]

উপন্যাসের সূচনাতেই দেবহুতি চরিত্রের মাধ্যমে নারীর প্রজনন-ভূমিকাকে এক নির্মম বাস্তবতায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অল্প বয়সেই বারবার সন্তান জন্ম দিতে দিতে সে যেন নিজের সত্তাকেই হারিয়ে ফেলে। দশ সন্তানের জননী হওয়া এখানে শুধুমাত্র একটি সংখ্যা নয়, বরং এটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানের প্রতীক—যেখানে নারীকে কেবল মাতৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, স্বপ্ন বা স্বাধীন সত্তা কোনও গুরুত্ব পায় না। এই প্রেক্ষাপটে লেখিকা সমাজের গভীরে প্রোথিত নারীনির্যাতন ও শোষণের চিত্রটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

"এঁদের মধ্যে কী ধরনের স্ববিরোধ ছিল তা আমার পিসিমার কেসটা বললেই বুঝতে - পারবেন। বালবিধবা পিসিমাকে ঠাকুর্দাদা লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন। পিসিমা কিছুতেই তাঁর 'কালা-মুখ' নিয়ে 'ধিঙ্গি'-র মতো স্কুলে যেতে চাননি। তাঁর বিয়ে দেবার জন্যেও ঠাকুর্দা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, যিনি বিধবা-বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন তিনি আদৌ যে কেন আট বছরের কন্যাকে গৌরীদান করেছিলেন তা বোঝা যায় না। পিসিমা পুনর্বিবাহের কথা শুনে বলেছিলেন 'মরণ আর কী।' বাড়িতে বসে লেখাপড়াতেও পিসিমার কোনও উৎসাহ ছিল না, সেলাই-ফোঁড়াই, গান-বাজনা কিছুতেই না। ঠাকুর্দাদা চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। বিষ্ণুপুরী ঘরানার সুবিখ্যাত রাধিকামোহন গোস্বামীর কোনও শিষ্যর সঙ্গে তাঁর খাতির ছিল, পিসিমার স্বাভাবিক সুকণ্ঠ শুনে তিনি

আগ্রহীও ছিলেন। কিন্তু পিসিমা দিনকতক শিখে নিজেই গুরুকে ছুটি দিয়ে দেন। অথচ পিসিমা স্বামীর ঘর করার সুযোগই পাননি।"[১৮]

এছাড়াও উপন্যাসে মন্বন্তরের ভয়াবহতা শুধু খাদ্যাভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের প্রতীক হিসেবেও উঠে এসেছে। একইভাবে দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের জীবনে যে গভীর ক্ষত তৈরি করে, তা প্রতিটি চরিত্রের অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্ম, জাতি ও শ্রেণিভেদ কিভাবে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে এবং সেই বিভাজনের সবচেয়ে বড় শিকার হয় নারী—এই বিষয়টিও লেখিকা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন।

"তাই বলে কেউ যেন মনে করবেন না মৎস্যভক্ষণকেই আমি জীবনের সমার্থক বলে মনে করছি। বালবিধবা পিসিমাদের আশ্রয় থাকতো ঠিকই, কিন্তু ঘর কি থাকতো? করুণা পেতেন, শ্রদ্ধা পেতেন, অধিকার পেতেন না। দজ্জাল অথবা মাটির মাটি জুতোর সুকতলা হবার সুযোগ পেতেন, স্বাভাবিক হবার সুযোগ থাকত না। রন্ধন-পটীয়সী হতেন কিন্তু চিন্তাপটীয়ান কত মানুষ যে কত আনন্দের, উপভোগের খোরাক বইয়ের দুই মলাটের মধ্যে ভরে দিয়ে গেছেন, জানতেন না। ভাতের সকড়ি, রুটির সকড়ি, আঁশ-নির্মিষ্যি খেঁটের কাপড়, মঙ্গলবারে নো মোচা, ছেলেদের জন্মবারে নো তেতো, নো পোড়া, কুমড়ো, লাউ, বেগুন সম্পর্কিত হরেক নিয়ম, জাতাশৌচ, মৃতাশৌচ, চতুর্থী, বিছুচ্ছুগঞ্জ ইত্যাদি হরেক জিনিস তাঁদের জানা ছিল। কিন্তু এই পৃথিবীটা কত সুন্দর, কত বড়, কত তার রং চং ঢং তা জানতেই পারতেন না। তাই-ই ওঁকে জীবস্মৃত মনে করছিলাম। তবে আমার এই মনে করা হয়তো ঠিক না-ও হতে পারে। জীবনের থেকে কোনও রস হয়তো তিনি পেতেন ঠিকই, আমাদের বীক্ষণে তা' ধরা পড়ছে না এই আর কি!"[১৯]

এই উপন্যাসে নারীর প্রতি সহিংসতা দুইভাবে প্রকাশ পায়—একদিকে মাতৃত্বের নামে তার শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার সময়ে তার উপর নেমে আসা নিষ্ঠুর নির্যাতন। দেবহুতির ক্লান্তি, নিঃস্বতা এবং অজান্তে প্রাপ্ত মুক্তি আসলে সেই সমস্ত নারীর প্রতীক, যারা নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে সমাজের চাপে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়। খারাপ ছেলে উপন্যাসে জিনা নামের নারী শুধু নিজের জীবনের ন্যায্য দাবি তোলে না, সমাজের প্রান্তিক নারী—যৌনকর্মী বনমালা রাহার মর্যাদার পক্ষেও দাঁড়ায়। এই উপন্যাসে বাণী বসু পুরুষতন্ত্রের ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতার মুখোশ খুলে দেন। বাণী বসুর নারীচরিত্ররা কেবল নিপীড়নের শিকার নয়, তাঁরা পরিবর্তনের দূত। তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, প্রতিবাদ ও স্বাধীনতার বীজ লুকিয়ে আছে। আদিম গোষ্ঠী থেকে আধুনিক নাগরিক সমাজ পর্যন্ত নারীর আত্মপরিচয় সন্ধানের এই যাত্রা বাণী বসুর লেখায় এক শক্তিশালী ধারাবাহিকতা তৈরি করেছে। তাঁর নারীচরিত্ররা বাংলা সাহিত্যে নারীর আত্মমর্যাদার নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যে বাণী বসুর উপন্যাসে নারীর অন্তর্জগৎ, সামাজিক বাস্তবতা ও ব্যক্তিগত সংগ্রাম গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর রচনায় নারীর জীবন সমাজের বিধিনিষেধ ও আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে গড়ে ওঠে, যা এক অন্তর্লৌকিক সংগ্রামের জন্ম দেয়। ভালোবাসা তাঁর কাছে রোমান্টিক নয়, বরং দায়িত্ব, চাহিদা ও সম্পর্কের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত—যেখানে আশ্রয় যেমন আছে, তেমনি দ্বন্দ্বও রয়েছে। দাম্পত্যকে তিনি জটিল প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখিয়েছেন, যেখানে ভালোবাসা, কর্তব্য ও স্বাধীনতার প্রশ্নে সংঘাত তৈরি হয়। এই সংকট কখনও সম্পর্ক ভেঙে দেয়, আবার কখনও আত্মউপলব্ধির পথ খুলে দেয়। ফলে নারীর জীবনসংগ্রাম, প্রেম ও দাম্পত্য—এই তিনটি বিষয় তাঁর সাহিত্যে পরস্পরনির্ভর এক সমগ্র অভিজ্ঞতা হিসেবে উঠে এসেছে।

বাংলা সমাজে নারীর জীবনযাত্রা বরাবরই নানা সামাজিক শর্ত, পারিবারিক মূল্যবোধ ও দাম্পত্য-নির্ভর পরিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে। স্বামীকে কেন্দ্র করে নারীকে তার "চূড়ান্ত পরিচয়" নির্ধারণ করার যে প্রবণতা দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে, তা দাম্পত্য ভেঙে গেলে বা স্বামীহারা হলে নারীর অস্তিত্বকে আরও গভীর সংকটে ঠেলে দেয়। বিধবা, পরিত্যক্ত বা একাকী—যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সমাজ তার চারপাশে তৈরী করে অসংখ্য অদৃশ্য প্রাচীর। এই বাস্তবতার মধ্যেই নারীর ব্যক্তিগত জীবনসংগ্রাম, ভালোবাসার ভিন্ন রূপ এবং আত্মসম্মান রক্ষার সংগ্রাম বারবার উঠে আসে সাহিত্যেও। বাণী বসুর **শ্বেতপাথরের থালা** সেই চিরন্তন নারীজীবনের অভিজ্ঞতাকে শুধু গল্পের মাত্রায় নয়, সমাজের ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বের গভীর স্তর ছুঁয়ে ব্যাখ্যা করেছে।

উপন্যাসের নায়িকা বন্দনার জীবনে যে বৈধব্য নেমে আসে, তা কেবল ব্যক্তিগত শোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এক কঠোর, নির্দিষ্ট আচারের চাপে তার জীবন ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসে। উত্তর কলকাতার এক বনেদি, রক্ষণশীল পরিবারের

বিধবা হিসেবে তাকে যে জীবন গ্রহণ করতে হয়—নিরামিষ, নিস্বাদ খাদ্য, সাদা পোশাক, মূক-নীরব শোকপ্রদর্শন—এসবই সমাজের দৃষ্টিতে "পবিত্রতা"র নিদর্শন। কিন্তু বন্দনা অনুভব করে, এই শোকের আচার আসলে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার আরেক রূপ; যেখানে নারীর ব্যক্তিত্ব, তার স্বাভাবিক আনন্দ কিংবা সৌন্দর্যবোধ সবকিছুকেই চাপা দিয়ে রাখা হয়।শেষ পর্যন্ত এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বন্দনা প্রতিবাদ জানায়, যা তার আত্মসচেতনতার পরিচয় দেয়— "যা দিলে আপনারও কষ্ট হয় না, আমিও খেতে পারি, এমন জিনিস দিলেই তো পারেন মা! রোজ রোজ এ নিয়ে এত কান্নাকাটির দরকার কি? আর এ আমি সত্যিই খেয়ে উঠতে পারছি না, পারছি না...।"[২০]

বন্দনার সংগ্রাম কেবল বিধবা পরিচয়ের বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার লড়াই। সন্তানের অসুস্থতায় রঙিন শাড়ি পরার সিদ্ধান্ত সমাজের চোখে নিয়মভঙ্গ হলেও তার কাছে তা মাতৃত্বের স্বাভাবিক দায়িত্ব। এই মানবিক বোধ তাকে নিজের ভেতরে নতুন করে চিনতে শেখায়। এখানে দাম্পত্য সংকট সরাসরি সম্পর্কভাঙনের নয়; বরং স্বামীর অনুপস্থিতিতেও সমাজ কীভাবে নারীর পরিচয়কে দাম্পত্যের ছায়ায় বেঁধে রাখে, তা স্পষ্ট হয়। বন্দনার উপলব্ধি—স্বামীর মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি নয়—নারীচেতনায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনে। তার নীরব প্রতিবাদ ও আত্মমর্যাদাবোধ উপন্যাসটিকে নারীর স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রতিরোধের এক শক্তিশালী দলিলে পরিণত।

বাণী বসুর **গান্ধর্বী** উপন্যাসে নারীজীবনের আরেকটি জটিল ও বাস্তব চেহারা নির্মিত হয়েছে—যেখানে মেয়েদের প্রতি সমাজের গভীরভাবে প্রোথিত অবজ্ঞা, বঞ্চনা ও সন্দেহের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি স্তরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পের শুরুতেই পাঠক উপলব্ধি করে, যতই সময় এগোক, সমাজের মানসিকতা সবসময় একই গতিতে এগোয় না। শিবনাথ ও তার পরিবারের আধুনিকতার মুখোশ দ্রুতই খুলে পড়ে অপালার জেঠুর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে—"ঘরে নেবেন, বরাবরের মতো, বাজিয়ে নেবেন না?" এই কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের সেই পুরোনো মনোভাব, যেখানে কন্যাদের মানুষ হিসেবে নয়, বরং একপ্রকার 'ব্যবহার্য বস্তু' হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। বিয়ের আগে মেয়েকে দেখার নামে তার শারীরিক সক্ষমতা, সৌন্দর্য, গৃহকর্মে দক্ষতা—এসবই পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই হয়। যেন সারাজীবন তার কাজ হবে ঘরকে পরিষেবা দেওয়া। আধুনিকতার দম্ভ যতই থাকুক, এই প্রাচীন মানসিকতা দূর হয়নি, বরং নীরবে এখনও প্রচলিত। বাণী বসু অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দেখিয়েছেন, আজও অনেক পরিবার কন্যার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয় এই প্রশ্নগুলো মাথায় রেখে—সে রান্না জানে কি না, তার দেহ-মন 'সুস্থ' কি না, এবং সে ঘরের মান বাড়াতে পারবে কি না— "আর বাইজি হয়ে ঘরে ঘরে মুজরো নেবার বদলে ঘরের বউ হয়ে সংগীত চর্চা করাটাই আমি ভালো মনে করি। আমি কেন যে কোনও ভদ্রলোক তাই মনে করবে।"[২১]

অপালা সঙ্গীতপ্রাণ এক মেয়ে; তার কাছে গান কেবল বিনোদন নয়—ভেতরের মুক্তির পথ। কিন্তু তার এই স্বাধীন সত্তার প্রথম শত্রু হয়ে দাঁড়ান ঘরেরই প্রবীণ কর্তা, তার জেঠু। সঙ্গীত জগত সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি আদ্যন্ত সন্দেহপূর্ণ—তিনি মনে করেন, গান-বাজনার সঙ্গে যুক্ত নারীরা মর্যাদা হারায়, সংসার টাকে। তাই তিনি অপালাকে নিজের রুচির বিরুদ্ধে সংসারের কাজে যুক্ত হতে বাধ্য করেন। তার কথায়— "সদুপায়ের সুখ শান্তি সামান্য শাকভাত অনেক বড়"—এই মন্তব্য নারীর স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করে গৃহবন্দিত্বকে 'ধর্ম' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

"মধ্যরাতে নাকি ভোরের দিকে অপালা জানে না সে ছাড়া ছাড়া দুটো স্বপ্ন দেখল... নিজেকে অপালা এমন কি শারীরিক ভাবেও ধরে রাখতে পারছে না। ওই পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে না পারলে যেন তার নির্মল শুচি সুরময় নারীত্ব মূল্যহীন অর্থহীন হয়ে যাবে।"[২২]

ফলত, অপালা যে জীবনের দিকে এগোতে চেয়েছিল—নাজনীন বেগমের কাছ থেকে ঠুংরি শেখা, সঙ্গীতের গভীরে ডুব দেওয়া—সবই ছিন্ন হয়ে যায়। উপন্যাসের এক জায়গায় বাণী বসু যে তুলনাটি দিয়েছেন, তা অপালার মনের মৃত্যুকে অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে তুলে ধরে—শ্যাওলা ধরা ডোবার মতো তার অস্তিত্ব আটকে যায়; ভেতরে সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও তা বুজে আসে। ফলে অন্যমনস্কভাবে সংসারের কাজে লেপ্টে থাকা এক 'যান্ত্রিক বউ'তে পরিণত হয় সে। তবুও অপালার সঙ্গীতসাধনা থেমে যায় না। অল্প সময়েই স্পষ্ট হয়—নারীর প্রতি এই অবহেলা ও অত্যাচার কেবল পারিবারিক আচারে সীমাবদ্ধ নয়; তার স্বামী শিবনাথও একই মানসিকতার ধারক। সোহমের সঙ্গে অপালার সঙ্গীতচর্চাকে শিবনাথ যখন কুৎসিত সন্দেহের চোখে দেখে, তখন অপালা প্রথমবারের মতো প্রতিবাদে সরব হয়। এখানেই বাণী বসু দেখান নারীর ভেতরে জন্ম নেওয়া

Published By: www.bijmrd.com ll All rights reserved. © 2025 ll Impact Factor: 5.7

আত্মমর্যাদাবোধের দৃঢ়তা—নীরবতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই। এই উপন্যাসটি তাই শুধু একটি মেয়ের সংগ্রামের গল্প নয়; বরং বৃহত্তর সমাজচিত্র—যেখানে নারীর প্রতিভা, পরিচয় ও ব্যক্তিস্বাধীনতা একের পর এক নিষেধাজ্ঞা ও সন্দেহের দেয়ালে আঘাত পায়। অপালার চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাণী বসু তুলে ধরেছেন, প্রতিকূলতার মাঝেও নারীর আত্মশক্তি কখনও নিভে যায় না, বরং আরও গভীর হয়ে ওঠে।

বাণী বসুর **পঞ্চম পুরুষ** উপন্যাসটি নারীজীবনের এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি সামনে আনে, যেখানে নারীর আত্মনির্ভরতা কেবল বিকল্প নয়, বরং এক পরিপূর্ণ জীবনবোধ। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এষা—এক স্বামী-পরিত্যক্তা নারী, কিন্তু এই পরিচয় কোনোদিনও তাকে দুর্বল করেনি। বরং পুরুষ-প্রধান সমাজের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, নিজের প্রতি দৃঢ় আস্থা এবং মর্যাদাবোধ তাকে আরও শক্ত করে তুলেছে। এষার জীবনে পুরুষের অনুপস্থিতি কোনো শূন্যতা তৈরি করেনি; বরং সে নিজের শর্তে, নিজের ছন্দে জীবনকে সাজিয়েছে। এষার সঙ্গে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সীমা নামের চরিত্রটি এক ভিন্ন মানসিকতার প্রতীক। সীমার ধারণা—মহিলা যদি অবিবাহিত বা স্বামীহীন থাকে, তবে সমাজ তাকে ব্যবহারযোগ্য 'বস্তু' বলে ভেবে নেয়। সেই ভয় থেকেই সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এষা এই ধারণার বিরোধিতা করে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়—নারী নিজেকে পুরুষের কাছে সমর্পণ করে বলেই পুরুষ তাকে নিজের সম্পত্তি ভাবার সাহস পায়। তার যুক্তি আরও পরিষ্কার হয় একটি তীক্ষ্ণ তুলনায়—রাষ্ট্রের পুলিশ বা সামরিক বাহিনী যেমন নাগরিকদের রক্ষা করে অথচ তাদের 'বস্তু' মনে করে না, পুরুষও যদি সত্যিই নারীর সহায়ক ও সঙ্গী হয়, তবে নারীর মালিকানা দাবি করতে পারে কীভাবে?

"হঠাৎ অরিত্র নিজের মধ্যেই একটা ধাক্কা খেল। এষার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? এষার স্বীকৃতিকেই এমন চরম এবং পরম ভাববার কোনও সঙ্গত কারণ আছে কি? আগেকার সম্পর্ক তো নেই-ই। সম্পর্ক আসলে খুব জটিল আকার ধারণ করেছে। যখন যেখানে থেকেছে, বছরে দু একবার করে এষার পুরনো ঠিকানায় নিজের ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দিয়ে গেছে অরিত্র। পুজোর পর এবং নববর্ষে তো বটেই। মাঝেও কখনও কখনও আরেকটা দিয়েছে। একটারও জবাব পায়নি। একটারও না। প্রত্যেকবার চিঠি ফেলে দেহলিদত্তপুষ্প হয়ে থেকেছে। একটার পর একটা দিন চলে গেছে অর্থহীনতার কবলে। তারপর কাজে-কর্মে-গার্হস্থ্যে-চিকিৎসায়-প্রাত্যহিকতায় ভুল। কিছু যে পাওয়ার কথা ছিল, পাওয়া হয়নি সেটা ভুলে যাওয়া। কিন্তু বিস্মৃতির মর্ম থেকে রক্তের ঢেউয়ে নিজেরই অজ্ঞাতে দোল লাগে। বসন্তের আকাশময় কার নীল শাড়ি ছড়িয়ে থাকে। প্রিয়লকরনগরের বীথিকাপথে গাছের শরীর থেকে কোনও মানবীর মৃদু দেহগন্ধ ভেসে এসে হঠাৎ কীরকম একটা কষ্ট দেয়। সারা জুলাই সহ্যাদ্রি মুখ ভার করে থাকে। মৌসুমী বায়ুর ধাক্কায় কী রকম একটা চকচকে আধো-অন্ধকার, ধূমল অথচ ভেতর থেকে আলো বিকীর্ণ হচ্ছে, পেছনে বুঝি বা সূর্য আছে। এষার গাত্রত্বকের সেই ভাস্বর পেলবতা মেদুর বর্ষায়, ভুলে থাকা সেও যে ভোলা নয় পুরোপুরি।"[২৩]

এই তুলনার মধ্য দিয়ে বাণী বসু দেখান, নারীর দমনপীড়নের পেছনে শুধু পুরুষ নয়; বহু ক্ষেত্রে নারী নিজেই দীর্ঘদিনের অভ্যাসগত আত্মসমর্পণের মানসিকতা বহন করে বেড়ায়। এষা পরিষ্কার ভাবে জানায়—নারীরা নিজেদের স্বামীর সম্পত্তি ভাবতে যে অদ্ভুত গর্ব অনুভব করে, সেটাই পুরুষতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। উপন্যাসে আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে—বিয়েকে কীভাবে বহু পরিবার 'বিনা পারিশ্রমিকের শ্রম' পাওয়ার উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। আমাদের সমাজে এখনও দেখা যায়—বউ আসবে বাবামায়ের সেবা করতে, ঘর সামলাতে, সংসারকে চালাতে। পণ নেওয়ার পরও আরও টাকা দাবি করে নির্যাতন, এমনকি খুন—এসব দুঃসহ বাস্তব আজও আমরা শুনে থাকি। পঞ্চম পুরুষ-এ বাণী বসু অত্যন্ত নির্ভুলভাবে এই সামাজিক নির্মমতাকে গল্পের বুনটে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এষার শ্বশুরঘরের অভিজ্ঞতা সেই বাস্তবতারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার কাছে 'ঘর' বলতে আশ্রয় নয়—একটি শ্রমস্থল। শ্বশুর তাকে ব্যবহার করতেন বেতনের সেবিকার মতো; শাশুড়ি দেখতেন খাস পরিচারিকার মতো। পরিবারের চোখে এষা ছিল শ্রমদাত্রী; মানুষ হিসেবে তার কোনো সত্তা, কোনো স্বাধীন পরিচয় ছিল না। তাই সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে যখন নিজের ছায়াটুকুও সাথে নিয়ে নতুনভাবে বাঁচতে শেখে—সেটা শুধু ব্যক্তিগত জয়ের গল্প নয়, নারীর আত্মমর্যাদার সার্বজনীন প্রতীক।

"এষার গায়ে কাঁটা দিয়েছে। তার ভেতরের যবনিকা কাঁপছে। সমস্ত অবরোধ খসে পড়তে চাইছে। পেছন ফিরে তাকে দেখতে চাইলেই দেখার দুঃসহ আনন্দে সে বুঝি জ্বলে যাবে। দু হাত মুঠো করে সে প্রাণপণে তার বাইরে বেরিয়ে আসতে চাওয়া হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তবহা নালীগুলোকে সামলায়। তারপর ফিরে তাকায়। কেউ নেই। শূন্য। মধ্যরাতের ডেক একেবারে শূন্য। কিন্তু সে

নিশ্চিত যে কেউ এসেছিল। তার পরিচিত কেউ নয়। অথচ যেন বহুদিনের চেনা। একটা অস্পষ্ট আকার, পোশাকের অস্পষ্ট রং, গাঢ় একটা পুরুষালি সুগন্ধ। হাওয়ার চেয়েও দ্রুতবেগে সে কি চলে গেছে?”[২৪]

শেষের অংশে যে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন—বৈধব্যপ্রথা—সেটি আসলে বাণী বসুর অধিকাংশ উপন্যাসে সমাজের গভীর অসাম্যকে বোঝাতে ফিরে আসে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে যে কয়টি রীতি পালন করতে হয়, তা সমাজচেতনার কতটা পশ্চাৎমুখী দিক তা প্রকাশ করে। আজও একজন বিধবা তার রঙ, খাদ্য, পোশাক, বিনোদন—সবকিছুর ওপর সামাজিক নজরদারি অনুভব করে। অথচ স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীকে কোনো রীতিই পালন করতে হয় না। এই দ্বিচারিতা দেখিয়ে বাণী বসু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন—সমাজ আধুনিকতার মুখোশ পরলেও তার গভীরে বহু পুরোনো মানসিকতা আজও সক্রিয়।

**‘মেয়েলি আড্ডার হালচাল’** উপন্যাসে বাণী বসু আধুনিক একক পরিবারের সংকটকে খুব বাস্তবভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসে দেখা যায়—রঞ্জনার বাড়িতে শেফালি কাজ করে। শেফালি কাজ করতে গিয়ে বাসন ভেঙে ফেললেও রঞ্জনা তাকে কিছু বলতে পারে না। কেবল “এখন যাও” বা “বা বা বা”-এর মতো শব্দে নিজের বিরক্তি চাপা দেয়। কারণ শেফালি যদি রাগ করে কাজ ছেড়ে চলে যায়, তাহলে রঞ্জনাকেই নিজের লেখালেখি, পড়াশোনা বন্ধ রেখে ঘরের সমস্ত কাজ সামলাতে হবে— রান্না, বাসন, ঝাড়পোঁছ, সবকিছু। শেফালির ছোটখাটো ভুল, এমনকি আচরণগত দোষও তাই রঞ্জনাকে মেনে নিতে হয়। কারণ বকাঝকা করলে কাজের লোকেরা অনেক সময়ই আর ফিরে আসে না, অথবা প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজ এড়িয়ে চলে। ফলে শেফালির দাবি অনুযায়ী তাকে টিভি দেখতে দেওয়া—এই ধরনের বাড়তি ছাড়ও রঞ্জনাকে দিতে হয়। এই ঘটনার মাধ্যমে বাণী বসু দেখাতে চেয়েছেন যে বর্তমান সমাজে একক সংসারের যে কাঠামো তৈরি হয়েছে, সেখানে কাজের লোকের উপর নির্ভরতা বেড়ে গেছে।

“শেফালি মুখিয়েছিল, বলে উঠল- ‘আমি অখাদ্য রাঁধি বলেই তো বউদির বন্ধুরা যেদিন আড্ডা থাকে সেদিন রান্না করে নিয়ে আসে। সবাই অবশ্য নয়। কাজলদিদি গোবরঘণ্ট আর জল-ভাত ছাড়া রাঁধতে পারে না, সুমিতাদিদিও হেভি ফাঁকিবাজ, তবে শিল্পীদিদি আর মালুদিদি হেক্তি রাঁধে। কিন্তু মনে রেখো দাদা, আমি যদি অখাদ্য রাঁধি তো শিল্পী দিদি রাঁধে কুখাদ্য। শুয়োর গোরু এই সব।”[২৫]

আগে যৌথ পরিবারে অনেকের মধ্যে গৃহকর্ম ভাগ হয়ে যেত। তাই অতিরিক্ত চাপ কারও ওপর থাকত না। কিন্তু আজকের দিনে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যখন চাকরি করেন, তখন ঘরের কাজ সামলানোর জন্য তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। আর সেই ব্যক্তিকে ধরে রাখার জন্যই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার নানা রকম দাবিদাওয়া মেনে নিতে বাধ্য হতে হয়। প্রাচীন সমাজে নারীর দায়িত্ব ছিল গৃহকর্ম আর পুরুষের দায়িত্ব ছিল বাইরের কাজ—এই প্রচলিত ধারণা সময়ের সঙ্গে বদলেছে। আজ নারী বাইরে কাজ করছে, তার সঙ্গে পুরুষেরও ঘরের কাজে সমানভাবে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহযোগিতা এবং কাজ ভাগ করে নেওয়ার মধ্য দিয়েই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কারণ পরিবারে নারী-পুরুষ দুইজনই একে অন্যের পরিপূরক—সহযোগিতাই সংসারকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

**‘অমৃতা’** উপন্যাসে বাণী বসু ভ্রূণহত্যা—সমাজের এক নির্মম বাস্তব—অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের নায়িকা অমৃতার তিন বছরের দাম্পত্যজীবন মোটেই সুখের ছিল না। সংসারের সমস্ত কাজ সামলে, নানা অপমান সহ্য করেও সে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিল। এমন সময় যখন অমৃতার গর্ভধারণের খবর জানা যায়, তার স্বামী অরিসূদন প্রথমেই পরীক্ষা ও সংসারের কাজের অজুহাত দেখিয়ে তাকে সন্তান নষ্ট করতে বলেন।

“আসলে লোভ! অস্বীকার করে লাভ নেই তার মা যে কোনও মূল্যে এই বিয়েটা চেয়েছিল। মায়ের মতো রক্ষণশীল আবহাওয়ায় বড় হওয়া, বাস করা একজন মহিলা। মেয়ের বিয়ে হবে, এই লোভে তিনি মেয়েকে বাঘের মুখে ছেড়ে দিতে দ্বিধা করলেন না। কী করে সে আর মায়ের ওপর আস্থা রাখবে? অমৃতা, অমৃতাই তাকে বাঁচার মন্ত্র দিয়ে গেছে। নিজে মরে। না, না, অমৃতা, তুই কখনও মরতে পারিস না, অমৃতা তুই অমৃতা। তুই কখনও অতি নশ্বর মানুষদের ভাগ্য স্বীকার করে নিস না। আমি শম্পা, তোর ছোটবেলার বন্ধু, কত ঈর্ষা করেছি তোকে, কত জ্বালিয়েছি অভিমান করে করে, কিন্তু আমি তোকে ভালবাসি, আমি তোকে শ্রদ্ধাও করি, পূর্ণ আস্থা আছে আমার তোর শক্তি, তোর বুদ্ধির ওপরে। অমৃতা তুই কোনও জ্যোতিবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে একবার দেখিয়ে দে। সংসারে ভালমানুষদের, ভাল মেয়েদের ক্ষতি হয় না, কেউ করতে পারে না।”[২৬]

দাম্পত্যজীবনে অমৃতা বহুবার অভুক্ত থেকেছে, অপমান সহ্য করেছে, তবু প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়নি। কিন্তু যখন নিজের গর্ভের সন্তানের ওপর আঘাত আসতে দেখল, তখনই সে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেয়— "কোন অপরাধে তাকে খুন করব? আমি পারব না।" অমৃতা বোঝায়—আজকের আইনে হয়তো এটাকে অপরাধ বলা হয় না, কিন্তু মানবিকতার বিচারে প্রাণ নষ্ট করা যে চিরকালই পাপ। কারও জীবনের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারোর নেই। অমৃতার মতোই তার বন্ধু দোলাও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে দোলার প্রেমিক অমিতাভ জানায়—সে দোলাকে ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত নয়। তাই দোলাকে অ্যাবরশন করতে বলে। দোলা রাগে-দুঃখে ভেঙে পড়ে। যখন তার মা-ও একই কথা বলে, তখন দোলা তীব্র প্রতিবাদ জানায়— "এম. টি. পি-র কথাতে কিন্তু দোলা ভয়ে বাঁশপাতার মতো কাঁপতে লাগল। মুখ রক্তহীন। সে শুধু কোনওমতে বলতে পারলে-মা, ওটা তো টিউমার নয়, একটা বাচ্চা ... আমার... আমার মা ... তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে সে তার পড়ার"[২৭]

**'শাকম্ভরীর দ্বীপ'** উপন্যাসে বাণী বসু নারী-অবমাননা ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার নির্মম রূপ উন্মোচন করেছেন। সুমনার জন্মপর্বেই কন্যাসন্তানের প্রতি সমাজের অবহেলা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—যেখানে ছেলে না হওয়ায় তাকে অগ্রাহ্য করা হয় এবং অনাথাশ্রমে বড় হতে হয়। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, কন্যাসন্তান এখনও বহু ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত, কারণ সে বংশরক্ষা করে না এবং সামাজিক বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়। উপন্যাসে জীবনের আরেকটি বাস্তব দিকও উঠে আসে—স্বপ্ন নয়, জীবিকার প্রয়োজনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের পথ নির্ধারণ করে। সুমনা ও অন্যান্য চরিত্রদের মাধ্যমে দেখা যায়, ব্যক্তিগত আগ্রহের চেয়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা বেশি গুরুত্ব পায়। এছাড়া রঞ্জনের চরিত্র আধুনিক সমাজের ভোগবাদী মানসিকতার প্রতীক, যেখানে সম্পর্কও অনেক সময় খেলার বস্তু হয়ে ওঠে। সুমনার প্রতি তার আচরণ এই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকেই প্রকাশ করে। সব মিলিয়ে, উপন্যাসটি কেবল ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির গল্প নয়; বরং নারীজীবনের বঞ্চনা, সামাজিক বৈষম্য ও মানবিক মূল্যবোধের।

**তথ্যসূত্র**


১. বিদ্যান্ত, লীলা, রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী, অভী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৮, পৃ. ১-২।

২. চক্রবর্তী, প্রণব কুমার, সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষায় লিঙ্গ প্রসঙ্গ, রিতা পাবলিকেশন, ২০১৯, পৃ. ২১২।

৩. তদেব পৃ. ২১৩।

৪. মুখোপাধ্যায়, দুলাল, কবিরাজ, উদয় শঙ্কর, হালদার, তারিণী, লিঙ্গ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের সমাজ, আহেলী পাবলিশার্স, ২০১৭, পৃ. ৮৩।

৫. বসু, বাণী 'খনামিহিরের ঢিপি', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ২৩০।

৬. আলি, রমজান, নজরুলের কয়েকটি কবিতা, সদ-উ-তন প্রকাশনী, বর্ধমান, ফাল্গুন ১৪১৪, পৃ. ২৪।

৭. বসু, বাণী 'খনামিহিরের ঢিপি', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৫১।

৮. বাণী বসু, 'মৈত্রেয় জাতক', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৯।

৯. বসু, বাণী, দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২৩৯।

১০. তদেব, পৃ. ২৩৯।

১১. বসু, বাণী, 'গান্ধর্বী', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ৯।

১২. তদেব, পৃ. ১০৯।

১৩. তদেব, পৃ. ১৮৫।

১৪. বসু, বাণী ‘শ্বেত পাথরের থালা’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৪৪।

১৫. তদেব, পৃ. ১৮৭।

১৬. তদেব, পৃ. ১৯৯।

১৭. বসু, বাণী, অষ্টম গর্ভ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৯।

১৮. তদেব, পৃ. ১১।

১৯. তদেব, পৃ. ১২l

২০. বসু, বাণী ‘শ্বেত পাথরের থালা’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৭।

২১. বসু, বাণী, ‘গান্ধবী’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬।

২২. তদেব, পৃ ৬১।

২৩. বসু, বাণী, দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৯৬।

২৪. তদেব, পৃ. ২৭১।

২৫. তদেব, পৃ. ৭০৮।

২৬. তদেব, পৃ. ৮৮২।

২৭. তদেব, পৃ. ৯৪৭।

**Citation:** **Mukherjee. S. & Halder. Dr. C. S.,** (2025) “পিতৃতন্ত্রের ভেতর থেকে প্রতিবাদ: বাণী বসুর উপন্যাসে নারীর অবস্থান”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-12, December-2025.